সংবাদ

তারিখ 19 JAN 2016
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ৩

জনে জনে জনতা

ডিজিটাল শিক্ষা শিশুর অধিকার
শিশুরাই হোক প্রোগ্রামার

মোস্তাফা জব্বার

মুজিবুর রহমান স্বপন এখন বাংলাদেশ কম্পিউটার সমিতির সহ-সভাপতি। ছয় বছর যাবত এক নাগাড়ে সমিতিতে নেতৃত্ব দিচ্ছে। আমার সাথেও সমিতিতেই কাজ করেছে চার বছর। এর বাইরেও বাংলাদেশের অন্যতম সেরা কম্পিউটার বাজার বিসিএস কম্পিউটার সিটির সভাপতির দায়িত্ব পালন করেছে। আমি যে কেবল স্বপনকে স্নেহ করি সেটাই নয়, স্বপন আমার কাছে অনেক দক্ষতা ও যোগ্যতা সম্পন্ন একজন মানুষ। ছাত্রজীবনে রাজনীতি করত বলে মানুষের সাথে কাজ করার ক্ষমতা অসাধারণ। কম্পিউটারের মেলা সাজাতে তার তুলনা বিরল। আমি যখন বাংলাদেশ কম্পিউটার সমিতির সভাপতি ছিলাম তখন সবার আগে স্বপনকে কম্পিউটার মেলার দায়িত্ব দিতাম। অবশ্য কম্পিউটারের মেলা করার জন্য আমার হাতে মানুষই ছিল তিনজন; স্বপন, শফিক ভাই ও সাইদ মুনীর।

বিসিএস কম্পিউটার সিটিতেও মেলার আয়োজন করার কাজটা স্বপন অহরহ করে। কদিন আগে জানিয়েছিল যে, বিসিএস কম্পিউটার সিটিতে ১৮ জানুয়ারি থেকে মেলা করবে। মেলার উদ্বোধন ও কর্মসূচিসমূহ নিয়ে কথা বলতে বলতে জানালো, এবারের মেলায় সে শিশুদের গুরুত্ব দিতে চায়। তখন সে মেলার স্লোগান প্রস্তাব করেছিল কম্পিউটার দিয়ে শিক্ষা গ্রহণ করা শিশুর অধিকার। স্বপন জানে যে, মেলার স্লোগান নিয়ে আমার আগ্রহ বহুদিনের। শুল্ক ও ব্যাটমুক্ত কম্পিউটার চাই স্লোগান থেকে একুশের স্বপ্ন ডিজিটাল বাংলাদেশ স্লোগানগুলো আমারই দেয়া। স্বপন জানে যে কম্পিউটার সমিতির মেলাগুলোতে স্লোগান দেয়াটা আমার প্রিয় একটি বিষয়। আমি স্বপনের প্রস্তাব শুনে বললাম, তুমি কেবল 'ডিজিটাল শিক্ষা শিশুর অধিকার' এই স্লোগানটা দাও। ১৭ জানুয়ারি ১৬-এর পত্রিকায় ওদের সাংবাদিক সম্মেলনের খবর পড়ে আনন্দিত হলাম এটি দেখে যে, স্বপন আমার দেয়া সেই স্লোগানটাকেই মেলার প্রতিপাদ্য বিষয় হিসেবে বেছে নিয়েছে। সম্ভবত সেই আলোকেই মেলাকে শিশুদের জন্য আকর্ষণীয় করার উদ্যোগও নিয়েছে। আমি স্বপন ও বিসিএস কম্পিউটার সিটির ব্যবস্থাপনা কমিটির সকলকে এজন্য অভিনন্দিত করি।

অনেকেই অবাক হতে পারেন যে, কম্পিউটার বিক্রি করে এমন একটি বাজারের মেলার স্লোগান শিশুদের নিয়ে কেন? সচরাচর আমরা বুঝি যে শিশুরা চকোলেট কিনবে, খেলনা কিনবে বা শিশুদের জন্য ব্যবহার্য সামগ্রীর প্রতি তাদের আগ্রহ থাকবে। বাজারজাতকরণের সূত্র অনুসারে এমন বিষয়কেই কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে রাখা উচিত যে, বিষয়টি ক্রেতাকে আকৃষ্ট করে। অন্যদিকে তাদেরকেই ক্রেতা হিসেবে গণ্য করা উচিত যাদের কেনার জন্য আর্থিক ক্ষমতা আছে যা যারা কেনার সিদ্ধান্ত নিতে পারেন। কম্পিউটারতো এখনও শিশুদের প্রিয় বস্তু নয় বা তারা কম্পিউটার কেনার সিদ্ধান্তও নিতে পারেনা। সেই অবস্থাতে শিশুদের কথা ভাবা কি সঠিক হলো?

আমি মনে করি, শিশুদের বিষয়টি আমরা বহুদিন ধরে অবহেলা করে আসছি। এমনকি কম্পিউটারকে শিক্ষার হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করার কথাই আমরা ভাবিনি। প্রথাগতভাবে ব্যবসা-বাণিজ্য-শিল্প-কল-কারখানা কম্পিউটার ব্যবসায়ীদের ভাবনার কেন্দ্রে রয়েছে। কোন কোন সময় সরকারের কথাও ভাবা হয়। কিন্তু দেশের চার কোটি ছাত্র-ছাত্রীর কথা মোটেই ভাবা হয়না। আমি মনে করি শিশুতো বটেই সামগ্রিকভাবে শিক্ষা খাত আমাদের তথ্যপ্রযুক্তি খাতের কেন্দ্রতেই বিবেচিত হতে পারে। সম্ভবত এটি এই খাতের সবচেয়ে বড় হার্ডওয়্যার বাজার। শিক্ষার ডিজিটাল কনটেন্টও হতে পারে বিশাল একটি ক্ষেত্র। এর কারণটি হচ্ছে যে বাংলাদেশে ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা ৪ কোটি এবং শিশুদের সংখ্যা প্রায় ২ কোটি। ওরা এখন বই-খাতা-কলম দিয়ে পড়াশোনা করে। বড়দের কেউ কেউ ল্যাপটপ জাতীয় যন্ত্র ব্যবহার করে। ওদের হাতে নিজেদের স্মার্ট ফোনও থাকে। কিন্তু শিশুরা না হতে পারে কম্পিউটারের মালিক না হতে পারে স্মার্ট ফোনের অধিকারী। ওদের হাতে বাবা-মার স্মার্ট ফোনটা হয়তো কখনও খেলনা হিসেবে পৌঁছে এবং তারা তাতে গেম খেলে আনন্দ পায়। এই শিশুদের হাতে যদি ডিজিটাল ডিভাইস হিসেবে কম্পিউটার দেয়া যায় তবে সেই সংখ্যাটি হবে দুই কোটি। বিষয়টি এখানেও থামবেনা। প্রতি বছর নতুন শিশুর জন্ম হচ্ছে এবং কেবলমাত্র প্রাথমিক স্তরে প্রতি বছর অন্তত ২৫ লাখ নতুন শিশু যোগ দেয়। দুই কোটি বিদ্যমান শিশুর সাথে যদি প্রতি বছরের ২৫ লাখকে যোগ করা যায় তবে আমরা বুঝতে সক্ষম হবো যে মুজিবুর রহমান স্বপন অত্যন্ত দূরদর্শী একটি সিদ্ধান্ত নিতে পেরেছেন।

তবে প্রশ্ন হচ্ছে যে, শিশুদের হাতে কম্পিউটার নামক ডিজিটাল যন্ত্র কিভাবে পৌঁছানো যাবে। এরই মাঝে আমরা সরকারকে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা স্তরে কম্পিউটার ল্যাব গড়ে তুলতে দেখছি। আমাদের সরকার ও নীতি নির্ধারকরা মনে করেন যে কম্পিউটার শেখা এবং কম্পিউটার দিয়ে শেখার জন্য ডিজিটাল ক্লাসরুম গড়ে তোলাটা কেবল তরুণ-তরুণীদের বা যুবাদের জন্যই হওয়া উচিত। যদিও কোন কোন প্রাথমিক বিদ্যালয়ে এরই মাঝে একটি করে ল্যাপটপ বা কোথাও একটি ল্যাপটপ-একটি প্রজেক্টর দেয়া হয়েছে তথাপি শিশুদের কথা, তাদের ক্লাসরুম বা শিক্ষকের কথা মোটেই ভাবা হয়নি।

আমার এ ভাবনাটি অনেক আগের। আমি ৮৭ সালে অ্যাপল কম্পিউটারকে শিক্ষাকে গুরুত্ব দিতে দেখেছি। আমি মালয়েশিয়ার স্মার্ট স্কুল দেখেছি। আমি ডেনমার্কের স্কুলের জন্য সফটওয়্যার বানিয়েছি। আমি ৯৭ সালে আমেরিকা থেকে সফটওয়্যার এনে নিজের ছেলেকে পড়িয়েছি। সেই ভাবনা থেকেই ১৯৯৯ সালের ২৪ ডিসেম্বর গাজীপুরের ছায়াবিথীতে আমি একটি স্কুল গড়ে তুলি। গাজীপুরের আজিমউদ্দিন কলেজের শিক্ষক মজিবুর রহমানের পরিচালনায় স্কুলটির উদ্বোধন করেন ডঃ জামিলুর রেজা চৌধুরী ও তার স্ত্রী সেলিনা মল্লিক। সেখানেই আমরা বাংলাদেশের শিশুদের জন্য প্রথম কম্পিউটার শিক্ষা বাধ্যতামূলক করি এবং তাদের ক্লাসরুমে কম্পিউটার নিয়ে গিয়ে কম্পিউটার দিয়ে লেখাপড়া করানো শুরু করি। তবে যে সমস্যাটি তখন তীব্র হয় সেটি হচ্ছে বাংলাদেশের পাঠ্য বিষয় নিয়ে বাংলায় তৈরি ডিজিটাল কনটেন্ট পাওয়া যায়নি। আমার নিজের পরিচালনায় ৩২টি মাল্টিমিডিয়া সেন্টার থেকে এ ধরনের কনটেন্ট তৈরি করার উদ্যোগ নিয়েও গুণগত মান ভালো না হওয়ায় সুবিধা করতে পারছিলাম না। অবশেষে ২০০৯ থেকে বিজয় ডিজিটালের প্রধান নির্বাহী জেসমিন জুই ডিজিটাল কনটেন্ট তৈরির নেতৃত্ব গ্রহণ করার পর ২০১১ সালে প্রথম বিজয় শিশু শিক্ষা আত্মপ্রকাশ করে এবং এরপর থেকে অবিরাম কাজ করতে করতে আমরা ২০১৬ সাল নাগাদ প্রাক প্রাথমিক থেকে দ্বিতীয় শ্রেণী পর্যন্ত সফটওয়্যার তৈরি করতে সক্ষম হই। জেসমিন ও তার বাহিনীকে এজন্য অভিনন্দন। ওরা আমার স্বপ্নটাকে পূর্ণতার দিকে নিয়ে এসেছে।

বস্তুত ২০১১ সাল থেকেই এদেশের শিশুরা কম্পিউটার দিয়ে লেখাপড়া করার জগতে দারুণভাবে প্রবেশ করে। অনেকেই ব্যক্তিগত কম্পিউটারে আমাদের সফটওয়্যারগুলো ইন্সটল করে শিশুদের তাদের শিক্ষা গ্রহণে সহায়তা করতে থাকেন। এরই মাঝে সরকারের এটুআই টিচার লেড কনটেন্ট নামক এক ধরনের কর্মসূচি গ্রহণ করে। সরকারের আইসিটি ডিভিশন বিনা টেন্ডারে ব্র্যাক নামক একটি এনজিওকে দিয়ে প্রাথমিকের সফটওয়্যার তৈরির উদ্যোগ নেয়। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ও ব্র্যাককে দিয়ে একইভাবে বিনা টেন্ডারে ষষ্ঠ শ্রেণীর ডিজিটাল কনটেন্ট বানানোর উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। সাবেক শিক্ষা সচিব এনআই খান এক সময়ে ষষ্ঠ শ্রেণীর সকল ছাত্রছাত্রীকে ২৫ লাখ ট্যাব দেবেন বলেও ঘোষণা করেছিলেন।

তবে এসব কাজের কোনটাই আলোর মুখ দেখার আগে আমরা একটি সাহসী উদ্যোগ নিতে সক্ষম হই। নেত্রকোনা জেলার পূর্বধলা উপজেলার আরবান একাডেমির প্রথম শ্রেণির ৪০টি শিশুর হাতে আমরা ৮ ইঞ্চির একটি ডিজিটাল ডিভাইস দিতে সক্ষম হই। মাত্র নয় হাজার টাকায় অরিজিনাল উইন্ডোজসহ এই ডিভাইসটিতে দেয়া হয় বিজয়-এর সকল শিক্ষামূলক সফটওয়্যার। ২৮ ডিসেম্বর ২০১৫ এই ক্লাসরুমটির উদ্বোধন করেন নেত্রকোনার জেলা প্রশাসক তরুণ কান্তি শিকদার। সেদিনের ফিতা কাটার ক্ষণটিতে আমি, জেসমিন, পরমাসহ স্থানীয় বিমিষ্টজনেরাও ছিলাম। এরপর আনন্দ মাল্টিমিডিয়া স্কুল গৌরীপুরের শিশু শ্রেণীর সকলকে এই ডিজিটাল ডিভাইস প্রদানের উদ্যোগ নেয়া হয়। এর বাইরেও অন্তত ২৫টি স্কুলে এই ডিভাইস পরীক্ষামূলকভাবে প্রদান করা হয়। আমি প্রত্যাশা করছি সরকারের টেলিকম বিভাগ সহসাই দেশের ২০টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর সকল ছাত্র-ছাত্রীর হাতে এ ধরনের ডিজিটাল ডিভাইস দেবার জন্য একটি পাইলট প্রকল্প বাস্তবায়ন করবে।

অন্যদিকে গত কয়েক মাস ধরে আমি চেষ্টা করছি শিশুদের সাথে সফটওয়্যার প্রোগ্রামিং বিসয়টিকে পরিচিত করাতে। প্রথমে নিজে এমআইটি র‍্যাব উদ্ভাবিত স্ক্রাচ নামক একটি প্রোগ্রামিং র‍্যাংগুয়েজ পরীক্ষা করে দেখি যে যে কোন বয়সের মিশুর জন্য খুব সহজে প্রোগ্রামিং ধারনা পাবার জন্য একটি অতি অর্তি চমৎকার প্রোগ্রামিং ভাষা হচ্ছে এটি। এরপর এর প্রশিক্ষণ সামগ্রী রচনার দিকে মনোযোগী হই। আমার কম্পিউটার বিজ্ঞানে স্নাতক স্তরে পড়ুয়া ছেলে বিজয়কে প্রশিক্ষণ সামগ্রী প্রস্তুতের অনুরোধ করলে সে সাগ্রহে কাজটি শুরু করে এবং এখন এটি একটি কর্মশালায় উপস্থাপনের স্তরে রয়েছে। ১৫ সালের নভেম্বর মাসে এ বিষয়ে উৎসাহব্যঞ্জক আরও একটি ঘটনা ঘটে। সরকারের আইসিটি বিভাগ শিশুদের প্রোগ্রামিং শেখার কর্মসূচি হাতে নেবার সিদ্ধান্ত নেয়। এটি এখন বাস্তবায়নের অপেক্ষায় রয়েছে।

আমাকে অবাক করে দিয়ে দৈনিক প্রথম আলোর ১৭ জানুয়ারি সংখ্যায় একটি খবর প্রকাশিত হয় যার শিরোনাম হলো, শিশুরাই হোক প্রোগ্রামার।

খবরটি এরকম, ব্ল্যাকবোর্ডে ইংরেজি হরফের 'খটমট' কিছু শব্দ ও সংকেত। বীজগণিতের সঙ্গে মেলে, আবার কোথায় যেন অমিল। চট করে বুঝে ওঠা কঠিন। অথচ ব্ল্যাকবোর্ডের সামনে বসা মুখগুলো দিব্যি এ নিয়ে আলোচনায় মত্ত। ফাঁকে ফাঁকে শিক্ষকের করা প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছে। ছাত্র-শিক্ষকের আলোচনায় একের পর এক সমাধান। শিক্ষকের চোখে তৃপ্তির আভা। এমন কাঠখোট্টা বিষয়ও যেন আনন্দ নিয়ে পড়ছে শিক্ষার্থীরা। বলছিলাম আউটসবুক প্রোগ্রামিং পাঠশালার কথা। আর 'খটমট' শব্দ ও সংকেত প্রোগ্রামিংয়ের ভাষা। আউটসবুক তরুণদের একটি সংগঠন। যাঁরা স্কুল ও কলেজ পড়ুয়া শিক্ষার্থীদের তথ্যপ্রযুক্তিতে পারদর্শী করতে মাঠে নেমেছেন। তাদের স্বপ্ন, একদিন স্কুল শিক্ষার্থীরাই বানাবে নতুন নতুন সফটওয়্যার ও গেম। এর অংশ হিসেবে প্রোগ্রামিং পাঠশালা শুরু, যেখানে বিনা মূল্যে শিক্ষার্থীদের সফটওয়্যার তৈরি থেকে শুরু করে প্রোগ্রামিংয়ের সবকিছু পড়ানো হয়।

৮ জানুয়ারি পাঠশালার পাঠদান চলার সময় নগরের কদম মোবারক এম ওয়াই উচ্চবিদ্যালয়ে গেলে কথা হয় বিদ্যালয়ের মূল উদ্যোক্তা শাহীন মোহাম্মদ ফারুকের সঙ্গে। তখন স্কুলপড়ুয়া শিক্ষার্থীদের প্রোগ্রামিংয়ে প্রাথমিক পাঠ দিচ্ছিলেন। শ্রেণীকক্ষে জনা বিশেক শিক্ষার্থী। তাদের প্রোগ্রামিংয়ের একটি সমস্যা সমাধান করতে দিয়ে আলাপের শুরু। শাহীন শুরু করেন গোড়া থেকে সময়টা ছিল ২০০৯ সাল। আমি তখন বিজিসি ট্রাস্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের কম্পিউটার বিজ্ঞানের স্নাতকের ছাত্র। কোনো ধারণা ছিল না বলে পড়ার সময় বেশ বেগ পেতে হচ্ছিল। অথচ প্রোগ্রামিং সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা থাকলে এই অবস্থা হতো না। তখনই প্রোগ্রামিংয়ের একটি স্কুল করার কথা মাথায় আসে। আরও কয়েকজন বন্ধুকে নিয়ে পটিয়া, চন্দনাইশ ও সাতকানিয়ার গ্রামে গ্রামে গিয়ে প্রোগ্রামিং শেখানো শুরু করি। দেখলাম শিক্ষার্থীদের মধ্যে এ নিয়ে আগ্রহ রয়েছে। তারা একটি সফটওয়্যার কীভাবে বানায়, কিংবা একটি গেমস তৈরিতে কী কী লাগে এসব জানতে চায়। বছর খানেক চলার পর এই কার্যক্রম বন্ধ হয়ে যায়। কিন্তু আমি হাল ছাড়িনি। স্নাতক শেষে একটি সফটওয়্যার নির্মাতা প্রতিষ্ঠানে চাকরি নেয়ার পর আবার চেষ্টা করতে থাকি বিদ্যালয় চালুর। ২০১২ সালের দিকে শিক্ষার্থীদের জন্য আউটসবুক নাম দিয়ে একটি ওয়েবসাইট তৈরি করি। তাতে ভালো সাড়া পাওয়া যায়। এর মধ্যে সাহায্যের হাত বাড়ান পরিচিতজনেরা। মনের জোর আরও বেড়ে যায়। শেষে ২০১৫ সালের ১৪ আগস্ট পুরোদমে বিদ্যালয়ের যাত্রা। এবার বড় পরিসরে। বর্তমানে আউটসবুকে নবম থেকে দ্বাদশ শ্রেণির ২৫০ জন শিক্ষার্থী রয়েছে। প্রতি শুক্রবার সময় ভাগ করে পাঠদান চলে কদম মোবারক এম ওয়াই উচ্চবিদ্যালয়ে। এ ছাড়া আউটসবুকের নিজস্ব প্রোগ্রামিং সাইট রয়েছে যেখানে নিয়মিত অনুশীলনের জন্য বিভিন্ন ধরনের প্রোগ্রামিং সমস্যা দেওয়া আছে। অনেকে এতে অংশ নিচ্ছে। প্রোগ্রামিং সমস্যাগুলো স্কুল-কলেজের শিক্ষার্থীদের উপযোগী করে দেওয়া। যাতে তারা খুব সহজেই তা বুঝতে পারে এবং সমাধানে আগ্রহ দেখায়।

যদিও এই স্কুলটি শিশুদের কেন্দ্র করে গড়ে তোলা নয় এবং বস্তুত স্কুল-কলেজের পাঠ্য বিষয় হিসেবে প্রোগ্রামিং শেখার যে চাপটা আছে তার চাহিদা মেটায় তবুও এমন উদ্যোগ প্রশংসা করার মতো। দেশের অনেক স্থানেই বাধ্যতামূলক আইসিটি শিক্ষাকে গিরে এ ধরনের স্কুল বা কোচিং সেন্টার গড়ে উঠেছে এবং এটি হয়তো এক সময়ে বেশ লাভজনক ব্যবসায়েও পরিণত হবে।

তবে আমরা বিষয়টাকে ভিন্নভাবে একটি শিক্ষা বা তথ্যপ্রযুক্তি আন্দোলন হিসেব নিয়েছি। আমরা বড়দের প্রোগ্রামিং ভাষা নিয়ে শিশুদের মাথা ভারি করতে চাই না। স্ক্রাচ এমন একটি প্রোগ্রামিং ভাষা যা দিয়ে কোন কোড লিকতে হয় না এবং কেউ একে খেলা হিসেবেই নিতে পারে।

আমি মনে করি শিশুদের হাতে ছোট আকারের ল্যাপটপ/ট্যাব প্রদান করে ওদের সাধারণ লেখাপড়ার পাশাপাশি প্রোগ্রামিং শেখার কাজটাও যুক্ত করা যেতে পারে।

এবার ভাবুনতো দুই কোটি বিদ্যমান শিশু এবং প্রতি বছরে ২৫ লাখ নতুন শিশু, তাদের সবার হাতে ডিজিটাল যন্ত্র, তাদের শিক্ষার ডিজিটাল কনটেন্ট, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের জন্য ডিজিটাল ক্লাসরুম, শিক্ষার ব্যবস্থাপনার জন্য হার্ডওয়্যার ও সফটওয়্যার মিলিয়ে তথ্যপ্রযুক্তির বাজারটা কত বড়?

এর ফলাফলটাও ভাবুন-১০ বছর পরে দেশে তথ্যপ্রযুক্তি এবং প্রোগ্রামিং জানা কতো বিশাল একটি তরুণ প্রজন্ম আমরা পাবো। স্বপনতো মোটেই ভুল করেনি-তাই না?

ঢাকা, ১৮ জানুয়ারি ১৬

লেখক : তথ্যপ্রযুক্তিবিদ, কলামিস্ট, দেশের প্রথম ডিজিটাল নিউজ সার্ভিস আবাস-এর চেয়ারম্যান- সাংবাদিক, বিজয় কীবোর্ড ও সফটওয়্যার-এর জনক ॥ ই-মেইল ঃ mustafajabbar@gmail.com; ওয়েবপেজ: www.bijoyekushe.net, www.bijoydigital.com